কার্বনের বাজার ও লাভক্ষতির হিসেবনিকেশ

কার্বন নির্গমন হ্রাসের নীতিমালা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে স্রেফ একটি আর্থ-রাজনৈতিক গেমপ্ল্যান। ভারতের কার্বন পরিকাঠামো থেকেই সে কথা স্পষ্ট। লিখছেন দীপায়ন দে

ওঠাপড়া। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তির পর তৈরি হয় 'এমিশন ট্রেডিং স্কিম' *আইস্টক*

আজ থেকে প্রায় তিরিশ কোটি বছর আগে শেষ হয়ে গিয়েছে কাবোনিফেরাস যুগ। এই যুগের শেষ পর্যায়ে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেনের মাত্রা ছিল বর্তমানের থেকে প্রায় তিন গুণ বেশি। তারই সূত্র ধরে ঘটে বিশ্ব উষ্ণায়ন, এবং ভৌগোলিক মহাদেশীয় একীকরণের ফলস্বরূপ হঠাৎ তাপমাত্রা নেমে আসায় শুরু হয় তুষারযুগ এবং কয়েক মাইল বরফের আস্তরণে চাপা পরে যায় সে যুগের প্রায় সমস্ত পশু ও উদ্ভিদ। চাপ ও তাপে তারা পরিণত হয় কার্বনে। সেই যুগের স্তূপীকৃত জীবাশ্ম জ্বালিয়েই আজ আমরা সভ্যতার আলোয় আলোকিত। অন্য দিকে এ কথাও সত্যি যে সে কালের সেই কার্বনের প্রজ্বলনে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন হেতু আজ আবার আমরা বিশ্ব উষ্ণায়নের শিকার এবং আর এক তুষারযুগের দ্বারপ্রান্তে। কার্বনের সে কাল ও এ কালের এই পটচিত্র আপাতদৃষ্টিতে একই রকম মনে হলেও একটা বড় তফাত আছে এবং সেটা অবশ্যই মনুষ্যজনিত কারণে।

ক্ষতি আবিষ্কার

মানবসভ্যতার একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিক হল সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন এবং অর্থনীতির বিকাশ। প্রাথমিক ভাবে, এই আর্থসামাজিক ব্যবস্থাপনা কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রবর্তিত হলেও শিল্প বিপ্লবের পর তা শিল্পায়ন এবং নগরায়নের পরিপূরক হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। আমাদের কার্বন-সচেতনতার উৎস এখানেই, তবে তার ভিত্তি হল পরিবেশ দূষণ, কার্বন নির্গমন নয়। যে মুহূর্তে বিশ্ববাসী বুঝেছিল সভ্যতার আকাঙ্ক্ষা এবং উন্মাদনা পরোক্ষে পৃথিবীকে টেনে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের পথে এবং সেই ধ্বংসের স্বরূপ আর কিছুই নয়, বিশ্ব উষ্ণায়ন, সেই মুহূর্তে সৎ এবং সামগ্রিক প্রচেষ্টায় সভ্যতার রাশ টেনে ধরার প্রয়াস যে মানুষ করেনি তা নয়। শিল্প বিপ্লবের ঠিক একশো বছর পরে ১৯৩৮ সালে জনৈক অপেশাদার বৈজ্ঞানিক গেকালেন্ডার জানিয়েছিলেন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে গেছে প্রায় ০.৩%। ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তন পরিকাঠামো তৈরির সম্মেলন সংগঠিত হয় এবং ১৯৯৭ সালে প্রণীত হয় প্রথম কার্বন নির্গমন প্রতিরোধী নীতিমালা, বা কিয়োটো প্রোটোকল, যাতে কিনা বায়ুমণ্ডলীয় কার্বনের বোঝা গুটিয়ে রাখা যায় ১.৫%-এর মধ্যে।

কিন্তু কতিপয় ধুরন্ধর যখন বুঝতে পারলেন যে এই গ্রহে আসলে আন্তঃগ্লেসিয়াল সময়কালের উপান্তে বিশ্ব উষ্ণায়ন অবশ্যম্ভাবী এবং সামগ্রিক চেষ্টায় নীতি শুধুমাত্র বানচালই হবে, প্রণীত বা গৃহীত হবে না, তখন কার্বন নির্গমন প্রতিরোধী নিয়মাবলী হয়ে দাঁড়ালো একটা আর্থ-রাজনৈতিক গেমপ্ল্যান। এক দিকে অন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেলের (আই পি সি সি) ধমক উপেক্ষা করে জমতে লাগল রাজনৈতিক ইচ্ছা-উপযোগী নীতির পাহাড়, যেমন মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, আইচি টার্গেট, নেট জিরো ভিসন ইত্যাদি, অন্য দিকে অর্থনীতির বিকার্বনীকরণের (ডি-কার্বনাইজেশন) নামে তৈরি হয়ে গেল কার্বনের অর্থকরী বেচাকেনা— এ কালের কার্বন বাজার। কারণ স্বভাব যাবে না ম'লে, নির্গমন কমবে না, বলে।

বাজারের উদ্ভব

২০১২ সালে কিয়োটো প্রোটোকল পরিত্যক্ত হওয়ার পর, ২০১৫ সালের প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত চুক্তিতে নির্গমনের মাত্রা হ্রাস করতে জারি করা হয় 'বাঁধো এবং বেচো' (ক্যাপ এন্ড ট্রেড) পরিকল্পনা, যাতে কিনা নির্গমনের মাত্রা-হ্রাসকারী দেশ বা সংস্থা তাদের নির্গমন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারেন। এই সুবাদে তৈরি হয় নির্গমন লেনদেন পরিকল্পনা বা 'এমিশন ট্রেডিং স্কিম' এবং কার্বন ক্রেডিট (যা কিনা এক টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের তুল্যমূল্য) এই লেনদেনের মুদ্রারাক্ষস হয়ে বসে। কিন্তু কার্বন ক্রেডিট-এর নির্ধারিত গণনাবিধি প্রণয়ন করা দুষ্কর। এই নিয়ে মতবিরোধের ফলে কার্বন বাজার দু'ভাগে ভেঙ্গে যায়, সর্বসম্মত বাজার বা কমপ্লায়েন্স মার্কেট এবং স্বেচ্ছাকৃত বাজার বা ভলান্টারি মার্কেট। একই ভাবে, কার্বন ক্রেডিট এর পাশাপাশি উঠে আসে আর একটা বিষয়, কার্বন অফসেট। যখন কোনও দেশ বা সংস্থা তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার অনুমোদনযোগ্য মাত্রার নীচে রাখতে পারছে, তখন তাদের করা নির্গমন 'কার্বন ক্রেডিট' দ্বারা পরিমাপ করা হয়। কিন্তু যখন কোনও দেশ বা সংস্থা অন্য কোনও দেশ বা সংস্থার গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমানোর প্রকল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করছে প্রতিদান হিসেবে, তখন তাদের পরোক্ষ ভাবে অর্জিত সেই নির্গমন হ্রাসের পরিমাপ করা হয় 'কার্বন অফসেট'-এর মাধ্যমে। দুই 'কার্বন বাজারে' দুই মুদ্রারাক্ষসের দর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের, ঠিক যেন আর একটা স্টক মার্কেট। সহজ করে বলতে গেলে বিষয়টা খুবই জটিল, নাকি অযথা জটিল করে তোলা হয়েছে যাতে এই লেনদেন সর্বসাধারণের জ্ঞানবুদ্ধির বাইরেই থেকে যায়? কথা হল, সর্বসাধারণের কীই বা যায় আসে তাতে। সেই বিষয়টাই সবচেয়ে জরুরি এই আলোচনায়।

◀ সবুজ সাথী। প্রান্তিক কৃষকরা লাভবান হতে পারবে?

ভারতীয় প্রেক্ষিত

বর্তমানে, অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি বা কৃষিবনবিদ্যার আওতায় ফুলফলের গাছ লাগানোর হিড়িক উঠেছে আমাদের দেশে। খুবই উত্তম, কিন্তু প্রথমত জানা দরকার, কেন? এবং দ্বিতীয়ত, কোথায়? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল, এই বনসৃজনজাত কার্বন ক্রেডিট বিক্রি হবে আন্তর্জাতিক কার্বন বাজারে এবং তার ফলে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ ঘটবে দেশে। লাভবান হবে প্রান্তিক কৃষকরা। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, বনসৃজন হবে একফসলি ক্ষেতে, কৃষকদের তত্ত্বাবধানে।

এ বার পর পর কয়েকটা বিষয় একটু তলিয়ে ভাবা যাক। এ ধরনের পুঁজি বিনিয়োগ ঘটে স্বেচ্ছাসম্মত কার্বন বাজার থেকে, যেখানে ক্রেডিট বা অফসেটের মূল্য প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এমত অবস্থায় কৃষকরা সঠিক দাম পেল কিনা কী করে জানা যাবে, যখন কিনা সরকারি কোনও কার্বন-পরিকাঠামোই নেই এ দেশে? ঢাকের দায়ে মনসা বিকোবে না তো? যদি সবটাই ঠিকঠাক চলে, কৃষক পাবে প্রায় দু'গুণ রোজগার, তা হলেও শর্ত মতো অন্তত তিরিশ বছর আটকে থাকবে জমি। হিসেব করলে দেখা যাবে ভারতের একফসলি জমির গড় আয়তন প্রায় ৩২%, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য সংস্থান রেখেই এই ঝুঁকি নেওয়া চলে। বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষায় জানা গেছে, বর্তমানে আমাদের দেশে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির আয়তন ০.১১ হেক্টর মাত্র, যা কিনা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সর্বনিম্ন এবং বর্তমানে আমাদের বার্ষিক খাদ্যশস্যের চাহিদা প্রায় তিন কোটি মেট্রিক টন। কোনও দেশেরই শস্যভাণ্ডারে এক কোটি টন খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হয় না যে কিনে খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। এ হেন অবস্থায় খাদ্যসংকটে পড়বে না তো তারা? এ ছাড়াও, তিরিশ বছরে হারিয়ে যাবে খাদ্যশস্যের প্রজাতি, জৈববৈচিত্র, এবং চাষের অভ্যাস। পড়ে থাকবে পঙ্গু কিছু মানুষ।

২০২১-এর বন মন্ত্রকের প্রতিবেদন খুঁটিয়ে পড়লে দুটো প্রশ্ন খুব সহজেই মাথায় আসে। প্রথমত, ভারতে ২৪.৬২% বনাচ্ছাদন থাকলেও, মাথাপিছু গাছের সংখ্যা মাত্র ২৮টা। প্রায় সর্বনিম্ন, তাই আরও জঙ্গল সৃজন করতে হবে। এবং লক্ষ্য অনুযায়ী মূল ভূখণ্ডের প্রায় ৮%, অর্থাৎ ২.৬৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অংশে সেই বনসৃজন করা উচিত। কিন্তু সেখানে গাছ লাগাতে পুঁজি বিনিয়োগ করা হচ্ছে না কেন? আর দ্বিতীয়ত, কী কারণে এমত অবস্থায় উত্তর-পূর্ব ভারতে মাত্র দু'বছরে নগরায়নের জন্য প্রায় ১ হাজার ২০ বর্গ কিলোমিটার জঙ্গল কাটা পড়েছে? শুধু তাই নয়, পার্বত্য উপজাতি এবং আদিবাসী সম্প্রদায় প্রায় ১ হাজার ৫০০ বর্গ কিলোমিটার জঙ্গল হারিয়েছে এই দু'বছরে। উদ্দেশ্যটা আসলে বনসৃজন নয়, ইনভেস্টমেন্ট। পরিত্যক্ত ২.৬৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অংশে জলবায়ু দুর্যোগের যে ঝুঁকি আছে, অথবা ২০২৩ সালের বিতর্কিত বন সংরক্ষণ আইনে যা ঝুঁকি আছে, তাতে কোনও বিদেশি সংস্থাই আর জঙ্গলে পুঁজি লগ্নিতে আগ্রহী নয়। সে অর্থে বরং একফসলি জমিতে নির্বিঘ্নে বিনিয়োগ করা চলে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হোলো, পার্শ্ববর্তী দেশ ভিয়েতনাম বা ইন্দোনেশিয়ায় কিন্তু ছবিটা একেবারেই বিপরীত, কারণ সে দেশে কার্বন পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষিদের কথা ভেবেই।

সব শেষে পড়ে থাকল এ দেশের প্রান্তিক চাষীদের উন্নয়ন। আজকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোই যদি নির্গমন-প্রতিরোধী জৈবিক চাষের জন্য প্রান্তিক কৃষকদের সমানুপাতিক ঋণ দেয় এবং সরকার জৈবিক ফসলের কার্বন অফসেটের স্বীকৃতিপত্র তুলে দেয় কৃষকদের হাতে হাতে, তা হলেই তো আর তাদের ফিরে তাকাতে হয় না। কিন্তু তাতে ধুরন্ধরদের কী লাভ? তাই সে গুড়ে বালি।

লেখক সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর এনভায়রনমেন্ট-এ রিসার্চ ও প্ল্যানিং বিভাগের প্রধান